৯

প্রথম আলো, ১ নভেম্বর ২০০৪

র‍্যাব ও আমাদের অসুখ

ফরহাদ মজহার

'র‍্যাব' হচ্ছে ইংরেজি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ। এর বাংলা করলে দাঁড়ায় জলদি কাম খতম করার সংঘ। ব্যাটালিয়ন কথাটা সামরিক। 'সামরিক' কথাটি বাংলা 'সমর' বা যুদ্ধ থেকে তৈরি। অর্থাৎ যা যুদ্ধ সম্পর্কিত; কিন্তু যুদ্ধ তো আমরা করি শত্রুর বিরুদ্ধে। দুশমনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য। যদি একটি জনগোষ্ঠী মনে করে তারা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখন নিজেকে রক্ষার জন্য তার যুদ্ধ ন্যায্য। এর বাইরে অন্যায্য বা অন্যায় যুদ্ধ আছে। হানাদার বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তা আমাদের চোখের সামনেই করে এবং করছে। এ মুহূর্তে জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার যুদ্ধ করছেন ইরাকি জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাহলে নিজেকে রক্ষা বা অন্যের ওপর প্রভুত্ব কায়েমের জন্য যুদ্ধ একটি বাস্তবতা। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধও ন্যায়সঙ্গত।

দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দরকার পুলিশ। যার কাজ শত্রুর নিধন নয়, সংবিধান ও আইনের মধ্যে থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুলিশ এই কাজটি সাধারণত করে জনগণের মধ্য থেকে। বিপরীতে সামরিক বাহিনীকে জনগণ থেকে দূরে রাখাই দস্তুর। ফলে পুলিশের চরিত্র আর সামরিক বাহিনীর চরিত্র এক নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভবের বিচার করলে দেখা যায়, এই দুটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদয় ও বেড়ে ওঠার ইতিহাসও আলাদা। যদিও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের ওপরে বসে সমাজেরই ওপর বল প্রয়োগের ক্ষমতা ও কাঠামো গড়ে ওঠার ইতিহাস দিয়েই উভয়কে বোঝা দরকার। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে বল প্রয়োগের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক এবং সামগ্রিকভাবে শাসক শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের এই একচ্ছত্র বল প্রয়োগের ক্ষমতার চরিত্র ও ব্যবহার দেখে একটি রাষ্ট্রকে যেমন চেনা যায়, তার শাসক শ্রেণীর চরিত্রও বোঝা যায়। যেমন– তারা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের হুকুমে চলে, নাকি তারা সংবিধান ও আইনের অধীনস্থ। তারা কোনো স্বাধীন বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা এবং সংবিধান ও আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য কিনা। ইত্যাদি।

খুবই সাধারণভাবে বুঝলেও নাগরিকরা বোঝেন যে, সামরিক বাহিনীর কাজ হচ্ছে বাইরের শত্রুর আক্রমণ বা হামলা থেকে জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা। আর পুলিশের কাজ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাদের উদ্দেশ্য যেমন ভিন্ন, তাদের চরিত্রও আলাদা। এখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়িত্ব পাওয়া বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তার বিপরীতে জলদি কাম খতম করার ব্যাটালিয়ন বা বাহিনী বানানোর চিন্তা এবং বাংলাদেশে তার বাস্তবায়নকে কীভাবে আমরা বিচার করব?

এ জাতীয় বাহিনী নতুন কোনো ব্যাপার নয়। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সংবিধান ও আইনের মধ্যে চলার কথা বলে, কিন্তু আসলে ক্ষমতায় থাকা না থাকার বিষয়টা স্থির হয় বল প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েই। সেই কারণে সাংবিধানিকভাবে পুলিশ ও আইনের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট থাকার পরও ক্ষমতাসীন শাসক ও শোষক শ্রেণীকে বারবারই বল প্রয়োগের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংবিধান ও আইনের বাইরে প্রয়োগ করতে দেখা যায়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সংবিধান ও আইনের বাইরে রাখা যায় এমন সশস্ত্র প্রতিষ্ঠান তাকে গড়তেই হয়। নিজ শ্রেণীর বা নিজ দলের ক্ষমতা সুরক্ষিত রাখা নইলে সম্ভব নয়। একদিকে সংবিধান, আইন বা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কেচ্ছা আর তার বিপরীতে নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগের চর্চা– এই দুই টানাপোড়েনের মধ্যেই এ জাতীয় বাহিনীর উদয় ঘটে। ইংরেজিতে এই ধরনের বল প্রয়োগের হাতিয়ারকে Paramilitary Force বলা হয়। সীমান্তে নজরদারি রাখা বা রক্ষার জন্য স্থায়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনীও Paramilitary Force। সেটা আক্ষরিক অর্থে। তারা প্রথাগত সেনাবাহিনীরই অংশ, শুধু কর্মবিভাগ ভিন্ন। কিন্তু রক্ষীবাহিনী বা র‍্যাব ধরনের যে প্যারামিলিটারি ফোর্সের কথা আমরা বলছি তার চরিত্র আলাদা। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আমলা, বিচার বিভাগ ইত্যাদি প্রথাগত বল প্রয়োগের হাতিয়ারের বাইরে এ ধরনের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী গড়ে তোলার বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান দুটি কারণ হচ্ছে: ১. একটি দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত নিপীড়ন বৃদ্ধি এবং ২. পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে একটি দেশে ধনী ও গরিবের ব্যবধান মারাত্মকভাবে বাড়া। যার ফলে শাসনব্যবস্থা ক্ষয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অন্যদিকে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর একটা দূরত্ব তৈরি হয়। যারা শ্রমিক বা কৃষকের মতো উৎপাদক নয়, আবার পুঁজির মালিকও নয়, তাদেরই পাতিবুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত ইত্যাদি পরিভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান শনাক্ত করে। এই শ্রেণী সমাজের ভাঙন, সন্ত্রাস, হত্যা, গুম-খুন, বোমাবাজি, গ্রেনেডবাজি ইত্যাদি আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কারণ বুঝতে সাধারণত অক্ষম থাকে, কিংবা বুঝতে চায় না। সমস্যার সরলীকরণের প্রতিই তাদের আগ্রহ বেশি থাকে। প্রতিদিনের পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিযোগিতার মুখে সে সর্বস্বান্ত ও সর্বহারায় পরিণত হওয়ার চাপের মধ্যে থাকে। ফলে সমাজের সঙ্কটের প্রতি তার মূল্যায়ন ও সমাধান দেয়ার পদ্ধতিও এ আতঙ্ক থেকেই তৈরি হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে তখন এ ধরনের ধারণা দানা বাঁধে যে, সন্ত্রাসীকে ধরে দল বেঁধে পিটিয়ে মেরে ফেললেই দেশে সন্ত্রাস কমবে কিংবা র‍্যাব জাতীয় কোনো ট্রিগারহ্যাপি সংস্থা দিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো সন্ত্রাসীদের গুলি করে সাফ করলেই সমাজ সন্ত্রাসমুক্ত হয়ে যাবে। সমাজে যখন ফ্যাসিবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে এবং *বিপ্লবী* রাজনীতি ও আদর্শের ঘাটতি হয় তখন পাতিবুর্জোয়া আতঙ্ক ফ্যাসিবাদী শক্তির সমর্থনের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ছিনতাইকারী বা ডাকাত সন্দেহে কাউকে ধরে পিটিয়ে মারা আর র‍্যাবের ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী মরা একই মুদ্রার এই পিঠ আর ওই পিঠ।

ইতিহাসে দেখা যায়, দমন-পীড়নের প্রয়োজন থাকলেও আলাদাভাবে প্যারামিলিটারি ফোর্স গঠন করার প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষমতাসীন শাসক ও শোষক শ্রেণী প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ দমন-পীড়নের জন্য তো খোদ সেনাবাহিনী বা বিশেষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীকেই কাজে লাগায়। লাগাতে পারে। এ ধরনের বাহিনীর দরকার হয় কেন তাদের? পাকিস্তান আমলে তো আমরা তাই দেখেছি। সেটা এখনো আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগসাজশে ঘটে; কিন্তু আগের মতো অতটা দৃশ্যমান বা ব্যাপকভাবে নয়; কিন্তু পাকিস্তানের শাসক তো এখনো সেনাবাহিনীই আছে।

স্নায়ুযুদ্ধের সময় তৃতীয় বিশ্বের সেনাবাহিনীর ওপর ভর করেই মার্কিন হানাদার পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়ন হয়েছিল। মার্কিন দেশেই সবচেয়ে নিষ্ঠুর জেনারেলদের প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে এবং এখনো সেই রেওয়াজ আছে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পুলিশ একাডেমি বা অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সিআইএর খুনি এজেন্ট বানানোর কারখানা, যাকে বলা হয় সেই ধরনের কারখানা এখনো চালু আছে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণের জন্য লোকজন যায় কিন্তু এককেন্দ্রিক বিশ্ব হয়ে হাওয়ার পর এ ধরনের গুপ্ত সম্পর্কের প্রয়োজন অতটা আর পড়ে না। লক্ষ্যে বদল না ঘটলেও তাদের উপযোগিতার মাত্রায় বদল ঘটেছে। পুঁজির পরিধির দেশগুলোকে শোষণ করার জন্য এখন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মতো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান আছে। আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের শৃঙ্খল যেখানে কার্যকর, সেখানে পুরনো পন্থায় গুপ্তহত্যা, সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একটি তাঁবেদার সামরিক সরকার ক্ষমতায় বসানোর প্রয়োজনীয়তা আর আগের মতো নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রধান দুটো হাতিয়ার হয়ে উঠেছে আমলা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী নয়।

এ দিকটা আমি তুলছি এ কারণে যে, নাগরিকদের দিক থেকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ব্যাপারটাকে বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সে দিকটা পরিচ্ছন্ন করা দরকার। বল প্রয়োগের জন্য শাসক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সব সংস্থাই গরিব ও খেটে-খাওয়া মানুষের দুশমন। সত্যি বলতে কি র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন আমাদের আমলাতন্ত্র দেশ ও দশের যে ক্ষতি করতে পারে আর আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাসানুদাস বহু আমলা যত সহজে দেশকে বিক্রি করে দিতে সক্ষম তার তুলনায় অধিক ক্ষতিকর কিছুই হতে পারে না। যদি তাই হয়, তাহলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রয়োজন হলো কেন বাংলাদেশে? এটা কি বিএনপির নতুন রক্ষীবাহিনী? এমন একটি বাহিনী যাকে তারা ক্ষমতায় থেকে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমার অনুমান র‍্যাব ব্যবহৃত হবে বহুজাতিক কয়েকটি কোম্পানি এবং বাংলাদেশের তাদের সঙ্গে যারা একটা ব্যবসায়িক আঁতাত করছে তাদের প্রাইভেট বাহিনী হিসেবে। অন্যান্য দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হিসাব করে দেখেছে যে, পিচ্চি হান্নানের মতো সন্ত্রাসী পোষার চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাওয়া সংঘবদ্ধ প্রাইভেট আর্মি রাখাই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। অস্ত্র চোরচালান, ড্রাগ স্মাগলিং বা অন্যান্য উপায়ে যে টাকাটা আয় হয় তা দিয়েই একটি বিশাল বাহিনী পোষা যায়। সেই টাকার ভাগ তাহলে পিচ্চি হান্নান, কালা জাহাঙ্গীর, সুব্রত বাইনদের দেয়া কী দরকার? আর বাংলাদেশের মতো একটা দেশে এই রকম মাথাভারি সেনাবাহিনী আর পুলিশ পোষারও দরকার কী? র‍্যাব জাতীয় একটা আধা আর্মি আধা পুলিশ থাকলেই যথেষ্ট।

র‍্যাবে অনেক ভালো মানুষ আছেন। কথাটা ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তারা নিঃসন্দেহে দেশ সন্ত্রাসমুক্ত হোক এটা চান। আমি আলোচনা করছি পুঁজির স্বভাব এবং কাজে কাজেই রাজনীতি নিয়ে। অন্যান্য দেশে এ ধরনের প্যারামিলিটারি ফোর্সের ভূমিকা তো আমরা এটাই দেখেছি; কিন্তু তাদেরও বুঝতে হবে সন্ত্রাসীকে 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করলেই সমাজ সন্ত্রাসমুক্ত হয় না।

তাহলে কী র‍্যাব রতন টাটার মতো বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করার জন্যই আসলে তৈরি হয়েছে? আইন-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা না পেলে বা সন্ত্রাস দমিত না হলে যে বিনিয়োগের কথা টাটা বলছে তা অসম্ভব। এটা তো শুধু গ্যাসের দাম পাওয়া না পাওয়া নয়। গ্যাস লুট করার 'বিনিয়োগ' প্রস্তাব। গ্যাস যদি ইন্ডিয়ায় না যায় তো বাংলাদেশেই থাকুক– এখানে এসেই টাটা তা ব্যবহার করবেন। সুন্দর; কিন্তু বিনিয়োগ নিছকই অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। এটা রাজনৈতিকও বটে। রতন টাটার সঙ্গে আমরা ব্যবসা করব কিনা সেটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন বাংলাদেশ আদৌ গ্যাস অন্যের কাছে বিক্রি করবে কি করবে না সেই প্রশ্ন থেকে আলাদা। তারপর আছে বিদেশী বিনিয়োগমাত্রই ভালো সেই ভুয়া প্রপাগাণ্ডা– জাতিসংঘের আঙ্কটাড (UNCTAD) যে ধারণার বিরুদ্ধে বহু গবেষণাপত্র বহু সুপারিশমালা তৈরি করেছে; কিন্তু সেসব তর্ক আমি এখন করার ফুরসত পাব না। আমি শুধু আমার কথার পিঠে সম্ভাব্য নজির দেয়ার জন্যই রতন টাটার এ যুগান্তকারী বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে কথা তুলে রাখলাম। ভবিষ্যৎই আমার কথা বলবে।

শেখ হাসিনার প্রাইভেট আর্মি গড়ে তোলার প্রয়াসটা ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়। তিনি রতন টাটার এ বিনিয়োগ প্রস্তাবের মজা ভোগ করতে পারলেন না। তিনি তার আমলে জয়নাল হাজারীদের যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেটা ছিল ভুল চর্চা। কিন্তু আওয়ামী লীগ একবার রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলে যে দাগা খেয়েছে সেরকম আবার র‍্যাব জাতীয় কিছু একটা করবে সেটা ছিল অসম্ভব। বিএনপি শুরু করেছিল আর্মিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। অপারেশন ক্লিনহার্ট ছিল সে প্রক্রিয়ার অংশ। সে অপারেশন ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু সেনাবাহিনীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার রাজনৈতিক মুশকিল আছে। সেটা সেনাবাহিনীর সদস্যরাও চাইবেন না। বেগম খালেদা জিয়া তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়ে সেই পরিকল্পনা বাদ দিয়েছেন বলে আমার মনে হয় না। আর বাদ দেয়ার প্রয়োজনও ছিল না। বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যেই এ ধরনের অপারেশনে কোনো অন্যায় ঘটে থাকলে সেই অন্যায় থেকে দায় মুক্তির বিধান আছে। ফলে তিনি ভয় করেননি; কিন্তু তার দরকার প্রাইভেট আর্মি। নতুন রক্ষীবাহিনী। সেনাবাহিনীকে এতটা নিচে নামাতে তিনি সাহস করেননি।

কিন্তু নতুন যে জাতীয়তাবাদী রক্ষীবাহিনী বিএনপি গড়ে তুলেছে সেটাই, আমার ধারণা, তার কাল হয়ে দাঁড়াবে। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য সেটা বিষধর সাপের মতো কাজ করেছিল। সে বিষের নীল আজও আওয়ামী লীগ নিজের গা থেকে খসাতে পারেনি। অপারেশন ক্লিনহার্টের পর বিএনপির প্রাইভেট আর্মি গড়ে তোলার প্রথম পরিকল্পনা ধরা পড়ে বাংলাভাই বাহিনীর প্রতি তার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সমর্থনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু হ্যারি কে টমাস সাহেব সেখানে বাদ সাধলেন। তিনি বাংলাভাই বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলাবলি শুরু করায় সেই পরিকল্পনা বাদ দিতে হলো। সে কারণেই যে প্রাইভেট বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছে তার আবির্ভাব ঘটাতে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে। শেখ মুজিবুর রহমান যখন রক্ষীবাহিনী করেছিলেন সেটাও তো রাষ্ট্রীয় বাহিনীই ছিল; কিন্তু সেটা ছিল শেখ মুজিবের নিজেরই বাহিনী। আওয়ামী লীগের বাহিনী। তার হাতে যখন একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, তখন তিনি এ ধরনের প্রতিভাবান পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন। দেশের বিনাশ যেমন তিনি ত্বরান্বিত করেছিলেন, নিজের মৃত্যুকেও কাছে ডেকে এনেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতাই ভোগ করছেন। এমন সময় এ একচ্ছত্র একনায়কী ক্ষমতা তিনি ভোগ করছেন যখন সত্যি বলতে কি তার পক্ষে জনসমর্থন নেই। বিএনপির সমর্থকরা এতে মনোক্ষুণ্ন হতে পারেন; কিন্তু ২১ আগস্টের ঘটনার পর তিনি তো গ্রেনেডবাজ আর হত্যাকারীদের ধরতে পারেননি। ২১ আগস্ট একটি গুরুতর জাতীয়

ঘটনা। যদি এ ধরনের গ্রেনেডবাজি ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে যারা রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করতে তৎপর, তাদের টিকিটাও ধরা গেল না, তাহলে র‍্যাব দিয়ে আমরা কী করব? প্রধানমন্ত্রী কি র‍্যাবকে দিয়ে হত্যার প্রদর্শনী দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে সমর্থন আদায় করতে চান? র‍্যাবের অভিযান শুরুর চার মাসের মধ্যে 'ক্রসফায়ারে' ৪১ জন মানুষ খুন করা হয়েছে। তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে'। এভাবে রাষ্ট্র চলতে পারে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার দলের মধ্যেই, আপনার দলীয় এমপি-মন্ত্রীদের মধ্যেও কি সন্ত্রাসী নেই? এবার তাহলে ক্রসফায়ারে তাদের দু-একজনকে মারুন, আমরা দেখি। তখন আমরা হাততালি দেব। পিচ্চি হান্নান জাতীয় সন্ত্রাসীদের, যারা আসলে বিএনপি-আওয়ামী লীগের নিছকই ভাড়াখাটা খুনি– আজ এ দল তো কাল ওই দল– তাদের পুলিশ হেফাজতে রেখে– এমনকি গুলিতে আহত অবস্থায় থাকার পরেও মারা হয়েছে। এতে আপনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় না। যুদ্ধেও আহত শত্রুকে এভাবে নির্বিচারে হত্যা আইনি বিধিবিধান, বিবেক এবং মানবিক আচরণের বিরোধী। এমনকি ধর্মীয় নীতি-নৈতিকতারও বিরোধী।

বিএনপি সন্ত্রাস দমনের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল। ব্যর্থ হয়েছে। ২১ আগস্টের পর জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের চেষ্টা হয়েছে। জনগণ সেই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেনি। এর কারণ হলো অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আর মার্কিন-ভারত-ইসরায়েলি অক্ষশক্তির হাতে বাংলাদেশকে তুলে দেয়ার মধ্যে যে একটা ফারাক আছে জনগণ সে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশীদের ডেকে এনে তদন্ত করার যে দাবি আওয়ামী লীগ তুলেছিল, তাতেও জনগণ সায় দেয়নি। জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে না সরানো আসলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আবার দেখার অনাগ্রহ ছাড়া আর অধিক কিছু নয়। এফবিআই এসেছে। এফবিআই গিয়েছে। তারা তাদের কাজ সেরে নিয়েছে; কিন্তু গ্রেনেডবাজ হত্যাকারীদের জোট সরকার ধরতে পারেনি। সরকারি তদন্ত কমিশন বলেছে বিদেশী শক্তি জড়িত। ভালো কথা কিন্তু গ্রেনেড মারল কারা? তারা এখনো ধরা পড়ল না কেন? বিদেশী শক্তি জড়িত বললে কি একটি দেশকে আমরা আমাদের আদালতে গ্রেনেড ছোঁড়া ও হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচার করতে পারব? তাহলে যেটা পারব না সেটা সরকারিভাবে বলছি কী উদ্দেশ্যে?

এ কারণেই আমি র‍্যাবের হত্যাকাণ্ডকে মূল জাতীয় প্রশ্ন আড়াল করার জন্য হত্যার প্রদর্শনী বলার পক্ষপাতী। এই ক্ষেত্রে বিএনপি সাময়িক সফল হবে এ অর্থে যে আমি অনেককে বলতে শুনেছি, এ ধরনের নির্বিচার 'ক্রসফায়ারে' হত্যার ফলে নাকি সন্ত্রাস কমবে। সন্ত্রাসীদের বিচার ছাড়া আইন-আদালতের তোয়াক্কা না করে খুন করার কারণে জনমনে 'স্বস্তি' ফিরে এসেছে। সমাজে যখন ফ্যাসিবাদী প্রবণতা প্রবল থাকে তখন এ ধরনের প্রপাগাণ্ডা মনমানসিকতারও জন্ম হয়। কিন্তু আমরা নিদেনপক্ষে একটি রাষ্ট্র চাই, যেখানে আইন আছে, আদালত আছে, বিচার আছে, শাস্তি আছে। আমরা নৈরাজ্য চাই না; কিন্তু নৈরাজ্যই তো চলছে। সন্ত্রাসী ধরে যারা ক্রসফায়ারে মারা গেছে বলে দাবি করছেন, তারা হয়তো নিজেরাই এ কর্মকাণ্ডের পরিণতি একটি দেশের জন্য, একটি রাষ্ট্রের জন্য কী হতে পারে জানেন না। তারা যেন ধরেই নিয়েছেন, কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে তালিকাভুক্ত করলে এবং তাদের সফটওয়্যার 'থার্ড আই' দিয়ে ডাটাবেজ বানালে সে লোকটিকে বিচার ছাড়া গুলি করে মেরে ফেলা যায়। মানুষের বিবেকের সুবিধা হচ্ছে এই যে, যার মধ্যে বিবেক আছে বিবেক তাকে ছেড়ে যায় না; কিন্তু বন্দুকের অসুবিধা হচ্ছে তার হাত বদল আছে। আজ যিনি ট্রিগার হ্যাপি, কাল তিনিই ট্রিগারের শিকার হতে পারেন। বন্দুকের এ বিচিত্র স্বভাব যারা জানেন তারা বন্দুক দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে পোক্ত করার কথা বলেন না, নীতি নৈতিকতা বিবেক চর্চার মধ্য দিয়েই নিজেদের ন্যায্যতা সমাজে প্রতিষ্ঠা করেন।

আমি মনে করি না নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সন্ত্রাস দমনের পথ হতে পারে। সন্ত্রাসের এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসী হয়ে ওঠার আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ আছে। সে কারণগুলো শনাক্ত করা এবং তার মীমাংসার জন্য উপযুক্ত নীতি দরকার। 'সন্ত্রাস' কোনোমতেই একটি ক্রিমিনাল ইস্যু নয়– যা শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ বা র‍্যাবের মতো সংস্থার ব্যাপার। সন্ত্রাসের প্রশ্নে আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক নীতি আগে তারপর আসে অপরাধী ধরা, বিচার করা অথবা অপরাধ প্রতিরোধ বা দমনের প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সেনাবাহিনীও নয়, পুলিশও নয়। দুটোকে মিশিয়েই এই বাহিনী করা হয়েছে। র‍্যাবের বিপক্ষে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামীপন্থীদের সমালোচনা আমরা পত্রপত্রিকায় পড়েছি। তারা বলেছে, র‍্যাব বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্য তৈরি হয়েছে। অথচ র‍্যাবের হাতে যারা ধরা পড়ছে বা মারা যাচ্ছে তাদের অনেকে সরাসরি বিএনপির সঙ্গেও যুক্ত। আর আওয়ামী লীগ যদি আসলে কথাটা মন থেকেই বলে থাকে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি আওয়ামী লীগের কর্মীদের মধ্যে প্রায় সকলেই সন্ত্রাসী বা বাংলাদেশের শীর্ষ খুনি বা হত্যাকারী। আওয়ামী লীগের স্বীকারোক্তি সেদিক থেকে অত খারাপ না। আমরা মেনে নেব, কথাটা সত্য।

তবে আওয়ামী লীগ যে কথাটা বলেনি বা বলতে চাইলেও বলতে পারবে না সেটা হচ্ছে জলদি কাম খতম করার বাহিনীটি আসলে রক্ষীবাহিনীরই নতুন সংস্করণ। রক্ষীবাহিনী হয়েছিল প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্যে। এক বাংলাদেশের *বিপ্লবী* রাজনীতির নেতাকর্মীদের হত্যা এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক *বিপ্লবে*র সমূহ সম্ভাবনা নস্যাৎ করা। দুই, মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল এবং কাজে কাজেই একটা গণমুখী সেনাবাহিনী গড়ে ওঠার যে সম্ভাবনা এবং রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়েছিল তাকেও ধ্বংস করা। রক্ষীবাহিনী তৈরি হয়েছিল সেনাবাহিনীর বিপরীতে– এক হিসেবে সেনাবাহিনীরই বিরুদ্ধে। তিন, একটা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র ও শক্তির বিকাশ নিশ্চিত করা যার নির্বাহী ক্ষমতার চরিত্র হবে একনায়কী। শেখ মুজিবুর রহমান সেই একনায়কী ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন আমলাদের দিয়ে। এমনকি আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মীদের দিয়েও নয়, চতুর্থ সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রপতিকে শুধু নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী করা নয়, একই সঙ্গে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের চরিত্রও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ইতিহাসের এ এক দারুণ প্রহসন যে বেগম খালেদা জিয়ার জোট সরকারও ঠিক তাই করছেন।

বাকশালী শাসন ও রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার মূল্য শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জীবন দিয়েই শোধ করেছেন; কিন্তু বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যায়নি, পিছিয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা আমরা আর পাইনি। তবুও এই মারাত্মক ভুলটি তিনি করেছিলেন। যিনি এতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বলে আমি দাবি করছি তিনি একনায়কী শাসন, বাকশাল, রক্ষীবাহিনী ইত্যাদি করতে গেলেন কেন? তারই উত্তর আছে শ্রেণী-বিচারে। যে শ্রেণীর তিনি প্রতিনিধি ছিলেন সেই শ্রেণীর পক্ষে গণতান্ত্রিক হওয়া ছিল অসম্ভব। ক্ষমতার যে রূপ এই শ্রেণী দেখাতে পারে সেটা বাকশালী রূপমাত্র। তার আমলের সঙ্গে বেগম খালেদা

জিয়ার আমলের পার্থক্য হচ্ছে এখন একটা লুটেরা শ্রেণীই শুধু তৈরি হয়নি, এই শ্রেণীর সঙ্গে বহুজাতিক পুঁজির আঁতাত ঘটেছে। অন্যদিকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসের ফলে পাতিবুর্জোয়া বা পরজীবী মধ্য শ্রেণীর সঙ্গে জোট সরকারের দূরত্ব বাড়ছে। এই দূরত্ব কমানোর জন্য কোনো আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক নীতি গ্রহণ করার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনোটাই জোট সরকারের নেই। অতএব, তাৎক্ষণিক সস্তা রাজনৈতিক স্টান্ট হচ্ছে র‍্যাব।

র‍্যাব আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র, বিনিয়োগ ও চেতনার একটা অসুস্থ লক্ষণ। আমার সমালোচনা শুধু র‍্যাবকে নিয়ে নয়, পাঠক খেয়াল করবেন, পিটিয়ে মানুষ মারার যে উৎসবকে আমরা প্রশ্রয় দিয়ে থাকি তার সঙ্গেই র‍্যাব তুলনীয়। জনতার পিটুনিতে ছিনতাইকারী নিহত আর র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' সন্ত্রাসী মারা গিয়েছে– এ দুটো ঘটনাকে আমি একই সূত্রে আমাদের সকলের অসুস্থতা বলেই শনাক্ত করি।

আমাদের চিকিৎসা দরকার।

১৩ মার্চ ১৪১১, শ্যামলী

ফরহাদ মজহার: কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক

১০

দৈনিক জনকণ্ঠ , ৯ নভেম্বর ২০০৪

ক্রসফায়ার থেকে জাতি মুক্তি পাবে কী করে, কবে?

ওয়াহিদুল হক

র‍্যাবের গুলিতে এ পর্যন্ত কত মরল? প্রশ্নটা নিরর্থক। রোজই মরছে যেহেতু। সর্বশেষ খবরে র‍্যাব তার ক্রসফায়ারের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য গণপিটুনি শব্দও নরহত্যার ব্যাখ্যা হিসেবে ব্যবহার করছে। এমনকি ব্যবস্থাও করছে গণপিটুনির। কোথাও কোথাও সত্যিকারের গণপিটুনিও হচ্ছে। র‍্যাব তার নাম হোক বা না হোক, রাষ্ট্রের যেকোনো সশস্ত্র আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর অবশ্যকর্তব্য গণপিটুনি ঠেকানো। পুলিশ বা মিলিটারি বা কোনো দো-আঁশলা রাষ্ট্র নিযুক্ত বাহিনীর গণপিটুনির নীরব দর্শক হওয়া অপরাধমূলক।

র‍্যাবের সরাসরি গুলিতে মরেছে অন্তত পঞ্চাশজন। তাদের গায়ে র‍্যাবের গুলি ঢুকেছে এবং তারা মরেছে তার ফলে। গুলি খেলেই মানুষ মরে যাবে, এ কোনো কাজের কথা নয়। বিশেষ করে যখন র‍্যাব পায়ে গুলি করে বলে শোনা যায়। অথচ র‍্যাবের গুলি খেয়ে কেউ আহত হয়েছে এবং হাসপাতালে গেছে কিংবা ধরা পড়ে থানা হাজতে আছে– এমনটা এখনও হয়নি। এর অর্থ কী? র‍্যাবের প্রতিটা শিকার আসলেই শুট টু কিল-এর শিকার। ইংরেজি না জানা এক প্রতিমন্ত্রী জাতিকে একটি শব্দ শেখালেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এমন দুর্গতি, বাঙালি জাতির এমন দুর্গতি যে, এত এত বিশ্ববিদ্যালয়ের এত ইংরেজি পণ্ডিত-অধ্যাপক সকলে মিলে যেন মেনেই নিচ্ছে– র‍্যাবের গুলি মানেই 'ক্রসফায়ারের' গুলি। তাহলে ওয়েব টার্গেটেড হয় কী করে? শুধু সন্ত্রাসীই মরে, র‍্যাব মরে না এ কেমন ক্রসফায়ার আর শুধুই সন্ত্রাসী মরে, আর কেউই মরে না, 'ক্রসফায়ার' জিনিসটা এত ডিস্ক্রিমিনেটিং সদ্বিবেচক হলো কী করে? না, র‍্যাব মানুষই খুন করছে বটে, কোনো আইনের অপেক্ষা না রেখে। নরহত্যা দণ্ডযোগ্য অপরাধ– র‍্যাব সদস্যরা জানে না কি তা? কিন্তু তারা এও জানে যে এই অপরাধটি করছে উপরআলা। শাস্তি হলে তার হবে। কিন্তু কথাটা ভুল। ঢাকা হাইকোর্টকে বিচারালয় মনে না করবার অনেক কারণ আছে। নাজমুল হুদা, ফায়ারব্র্যান্ড ছোকরা-মন্ত্রী আগাপাস্তলা অবৈধ ধনৈশ্বর্যে চোবানো, কাগজে কলমে সরকারি নথিতে একটা নতুন শ্রেণীর চাকরি সৃষ্টি করেছে। এ চাকরিতে নিয়োগ আছে, মাইনে আছে, সুযোগ-সুবিধা আছে সব– শুধু নেই কাজ। চাকরি হতে হলে তার একটা যব ডেস্কিপশন থাকতে হবে। এদের নেই। এই নতুন চাকরির নাম 'পোষ্য কোটা'। হুদার নিজের হাতের লেখা সুপারিশপত্র ছাপা হয়েছে কাগজে। অভিযুক্ত বিচারপতি ফয়েজী এখন বিপদে আছে। নাজমুল হুদার বিপদ নেই কেন? কোনো মন্ত্রী কি 'পোষ্য কোটা' বলে কোটা বানিয়ে তাতে চাকরি দেবার জন্য সুপারিশ (বা আদেশ) করতে পারে। তার বিচার হবে না কেন? হচ্ছে না কেন?

এবার ঢাকা হাইকোর্টের কথা আমলে এনে সেই বিশ্ববিখ্যাত ন্যুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা মনে করি। গোয়েরিং গোয়েবলস থেকে বেজায় ইনটেলেকচুয়াল এ্যালবার্ট স্পিকারের কথা তো ছিল তারা সকলে আদেশমতো কাজ করেছেন। অপরাধ হয়ে থাকলে আদেশদাতার (অর্থাৎ হিটলারের) হয়েছে। তারা কেন শাস্তি পাবে? সে কথা টেকেনি। সকলে শাস্তি পেয়েছিল। র‍্যাব সদস্যরা নরহত্যার দায় থেকে রেহাই পাবে কী করে? তারা পাবে না। পাবেন না বোধহয় লুৎফুজ্জামান বাবরও, আলতাফ খলিফাও।

আলতাফ সাহেবও ওই চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন আমরা তো সন্ত্রাসী মারছি অত্যন্ত ক্লিন হার্ট নিয়ে। ধোপে টেকেনি সে কথা। বন্ধ করতে হয়েছে সে অপারেশন (পাঠক, মনে আছে অপারেশন সার্চলাইট? সে অপারেশনের কথা ভুলবার চেষ্টায় খালেদা প্রধানমন্ত্রী, তাঁর কথা না মেনেই তারেক আজ যুবরাজ, বাংলাদেশ উপনীত মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের দ্বারে। পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী, পারভেজ মোশাররফের সর্বশেষ খাদেম, বলে কিনা, ঢাকার মাটিতে, কারো কাছে গণতন্ত্র শেখবার নেই পাকিস্তানের। অপারেশন সার্চলাইট সেই গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট নমুনা। বাঙালির ভাগ্য খালেদা গংয়ের জন্য এসব অপমান উৎপাত সহ্য করতে হয় তাকে)। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ধুয়াধারী সরকার সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক এক দায়হীনতা আইন (বেআইন) পাস করে ক্লিনহার্টের মিলিটারিদের রেয়াত দেয় দণ্ড থেকে, পুলিশদের দেয় না। বাংলাদেশ পুলিশ ঘুষ নেয়ার বাইরে কিছু করবার সময় পায় না। আমদানি ভালো থাকলে আত্মমর্যাদা তাকে তুলে রাখতে অসুবিধা বোধ করে না।

বাবর সাহেব বললেন, র‍্যাবের দরকার নেই ইনডেমনিটির। পৃথিবীর সর্বত্র আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহার জায়েজ। তার র‍্যাব নরহত্যার প্রতি ক্ষেত্রেই খুন হবে যে বা যারা, সে বা তারাই আক্রমণ করেছে প্রথম। খুন হতেই হবে সেই জন্য বোধহয় তারা সর্বদা প্রথম আক্রমণ করলেও কোনো বারেই (আমার জানামতে রাউজানের সাকা চৌধুরী পোষ্য জানে আলমের ক্ষেত্র ছাড়া) র‍্যাবের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। কোন জাদুমন্ত্রে তাদের গুলিগুলো

এমন হয়েছে যেন মোমে তৈরি কিংবা একেবারেই জলে। এ না হয় মানা গেল, তারা আত্মরক্ষার্থে অর্থাৎ গুলির পাল্টা গুলি করেছে কে বলল? প্রতিমন্ত্রী বলছেন, তাতেই হবে? প্রতিমন্ত্রী তো বিবাদি পক্ষ এখানে, তিনি বিচারক হয়ে রায় দিলে এ দেশটা রাষ্ট্র থাকবে না। রাতারাতি জঙ্গল হয়ে যাবে। তিনি সেই রকম রায় দিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশটা যে এখনো জঙ্গল হতে বাকি সে শুধু খুনিরা নিজেরা এবং তাদের ভাড়াটিয়া আমলা, মস্তান, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্ররা মনে করে।

মরছে যারা তারা সন্ত্রাসী? তাতেই তাদের মেরে ফেলা যায়? বিচারালয় আছে কী করতে? লোকজনে বললেই তারা সন্ত্রাসী নয়, বাবর সাহেব বললেও নয়। যতক্ষণ বিচারালয়ের এজলাস থেকে যথাযোগ্য বিচারকের দ্বারা তারা সন্ত্রাসী বলে সাব্যস্ত না হচ্ছে ততক্ষণ তাদের সন্ত্রাসী বলার সাধ্য আমার নেই, বাবরেরও নেই। এবং বিচারক সাব্যস্তকৃত সন্ত্রাসীর জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করবেন তা ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার শাস্তি কেউ তাকে দিতে পারবে না। বাবর না, পুরো মন্ত্রিসভাও না। প্রমাণিত সন্ত্রাসীকে আদালত যাবজ্জীবন দিতে পারে। নানা মেয়াদি কারাদণ্ড, অর্থদণ্ডও করতে পারে– আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। না, র‍্যাব-যতই কেননা তারা ডাকাতের মতো, পশ্চিমী দুনিয়ার পুরনো দিনের জনদস্যুর মতো পোশাকে, জলি রোজার উড়িয়ে কিংবা না-উড়িয়ে, নাগরিকের প্রাণ-সংহার করুক– এ নিতান্তই নরহত্যা এবং ক্রসফায়ার ইত্যাদি অশিক্ষিত শব্দ আড়াল সৃষ্টি করলে এর পেছনকার উদ্যোগও ম্যালাফাইডি হয়ে যায় মাত্র।

এখন কথা হলো মন্ত্রী এবং সরকার মনে করছেন তাঁরা ঠিকই করছেন। সংবিধান একটা কাগজ ছাড়া তো কিছু নয় এবং সন্ত্রাসী দমনের আর কোনো রাস্তা তাদের নেই। সুতরাং ক্রসফায়ার নামের অনতিপ্রচ্ছন্ন খুন চলতেই থাকবে? বলা হচ্ছে– মেরে ফেলা এসব জঘন্য সন্ত্রাসী ভয়াবহ লোক, তাদের অপরাধের কথা ভাবলে গা শিউরে ওঠে, যেমন খালেদা জিয়ার গা শিউরে ছিল দেশের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে। এসব সন্ত্রাসী আসলেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন একেকটা। যারা তাদের বানিয়েছিল তাদের আর মানছে না, সন্ত্রাস করেই যাচ্ছে। বিএনপি কত যত্নে, কত আদরে, কত ট্রেনিংয়ে তাদের গড়ে তুলেছিল হিন্দু এবং আওয়ামীদের চাবুক হিসেবে অপূর্ব সেবা দেয়ার জন্য এবং বিএনপি দল ও সরকার তাদেরকে আড়াল দিয়েছে গ্রেফতার ও বিচার থেকে আঠারোটা পঁচিশটা মামলা পর্যন্ত। এখন কী হলো তাদের মেরে ফেলতে হবে। মানতেই হবে সরকার মহা অকৃতজ্ঞের মতো কাজ করছে। তবে সবার ক্ষেত্রে নয়। গডফাদাররা সকলে, ব্যতিক্রমবিহীনভাবে, সুরক্ষিত আছেন এবং থাকবেন। তেমনি সুরক্ষিত থাকবে সেই সকল কুকুর যাদের গলায় মালিকের দেয়া বেল্ট আছে। বাকি সবকে নেড়ি কুত্তার মতোই মরতে হবে। এই বিএনপির আইন। তার আইনের রাজত্ব।

রাজা দ্বিতীয় হেনরি পাদ্রী টমাস বেকেটের রাজকার্যে নাক গলানোর দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠেছিলেন, কেউ কি নেই যে আমাকে এই লোকের নিস্কৃতি দেয়! রাজপক্ষের শক্তিধর ত্বরিত গিয়ে বেকেটকে হত্যা করে এবং দ্বিতীয় হেনরি, অশেষ বুদ্ধিমান বলে, নগ্নপদে মুকুটবিহীন চার্চে গিয়ে যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করেন, হাঁটু গেড়ে বসে। আমরা বাংলাদেশের জনগণ সে সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের সব করতে রাজি যদি কেউ এই জালিমদের মানুষের মুখে চেয়ে হটিয়ে দেয় মাত্র। খুনোখুনির দরকার নেই।

ওয়াহিদুল হক: সঙ্গীতজ্ঞ ও কলাম লেখক

১১

যুগান্তর, ১৩ নভেম্বর ২০০৪

র‍্যাব বিতর্ক

ফরহাদ মজহার

‘র‍্যাব’ বা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের সমাজে। নাগরিকদের মধ্যে সম্মানিত অনেকে আছেন যারা বলছেন– ‘র‍্যাব’ এর ভূমিকা আমাদের প্রশংসা করা উচিত, সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব ইতিমধ্যেই ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে ‘মানবাধিকার’-এর কথা তুলে তীব্র সমালোচনা চলছে যে, ‘ক্রসফায়ারে’ র‍্যাবেরই হেফাজতে থাকা অভিযুক্ত অপরাধী মারা যাওয়া গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমি র‍্যাব বা ইংরেজি Rapid Action Battalion- এর বাংলা করেছি ‘জলদি কাম খতম করার সংঘ বা বাহিনী’ (দেখুন প্রথম আলো, ১ নভেম্বর, ২০০৪)। আমি র‍্যাবের সমালোচনা করি এবং নাগরিক হিসেবে নিজের কথা স্পষ্টভাবে বলা দায়িত্ব বলে মনে করি। আমি র‍্যাববিরোধী। সেটা নীতিগত। আমি মনে করি না, এটা সন্ত্রাস দমনের পথ। কিন্তু আমার কথা নিছকই সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের আন্তরিক ও বাহ্যিক বিকাশ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিগঠন এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার গুরুতর প্রশ্নের আলোকেই র‍্যাবকে বিচার করতে হবে। তারই কিছু প্রাথমিক কথা ছিল প্রথম আলোতে। কিন্তু র‍্যাব নিয়ে সামাজিক তর্ক-বিতর্ককে ইতিবাচক অর্থে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য আরও কয়েকবারই এ বিষয়ে লেখা দরকার হবে।

র‍্যাব সম্পর্কে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া আছে আমাদের সমাজে। প্রথমে আসে তাদের কথা যারা সত্যি সত্যিই মনে করেন যে, র‍্যাব, চিতা, বাঘ বা ভাল-ুক জাতীয় হিংস্র কিছু বল প্রয়োগের রাষ্ট্রীয় সংস্থা ছাড়া আমরা সন্ত্রাস দমন করতে পারব না। তারা র‍্যাবের বিরোধিতাকে পছন্দ করছেন না। তাদের এক পক্ষের যুক্তি হচ্ছে- খালেদা জিয়া সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, ফলে শাসক হিসেবে তিনি শক্ত হাতে সন্ত্রাস দমন করার চেষ্টা করছেন, এটা ভাল। সরকার যদি সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে যায় তাহলে তার বিপদ র‍্যাবের মানবাধিকার লজ্ঞনের চেয়েও বেশি। র‍্যাব সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার লজ্ঞন করেনি এই দাবি তারা করছেন না। কিন্তু ওর ক্ষতির চেয়েও সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী সন্ত্রাসের যে চেহারা ফুটে উঠছিল তাকে দমন করাই হচ্ছে এখনকার প্রথম কাজ। অতএব র‍্যাবের সমালোচনা এখন ঠিক না।

তাদের আরেক অংশ র‍্যাবের বিরোধিতাকে বিরোধী দল আওয়ামী লীগের বা আওয়ামী ধারার সমর্থকদের রাজনৈতিক চালবাজি বলেই মনে করেন। যদিও মানবাধিকার কর্মীদের একটা বড় অংশই র‍্যাব গঠনের সাংবিধানিক বা আইনি প্রশ্ন না তুলেও তার কর্মকাণ্ডের মানবাধিকার লজ্ঞন সংক্রান্ত দিকের তীব্র সমালোচনা করছে।

সমর্থকদের যুক্তি হচ্ছে- ব্যবসা, বিনিয়োগে চাঁদাবাজি বন্ধ করার ক্ষেত্রে র‌্যাব প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এই দাবি মিথ্যা নয়। ঈদের সময় সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেও র‌্যাবের ভূমিকা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে। র‌্যাবের সমর্থকদের কথার সারমর্ম হচ্ছে, ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতিটাই আমাদের দরকার। এরকম কিছু একটা না হলে সন্ত্রাসীরা খামোশ হবে না, সন্ত্রাসও বন্ধ হবে না। সমাজে যারা সম্পদশালী, ব্যবসা-বানিজ্য ও ছোটবড় পুঁজির মালিক এবং চাকরিজীবীদের মধ্যে উচ্চবিত্ত না হলেও মোটামুটি সচ্ছল তারাই এই ধারণা বেশি পোষণ করছেন। সমাজের সম্পদশালী, ছোটবড় পুঁজির মালিক এবং সচ্ছল চাকরিজীবীদের পাশাপাশি যদি গরিব ও খেটে খাওয়া মানুষও ভাবতে শুরু করে যে, সন্ত্রাস নিছকই একটা অপরাধ, 'সন্ত্রাসী' হওয়া না হওয়ার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক নীতির কোন যোগ নেই, তখন ফ্যাসিবাদ একটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে সমাজে শেকড় গেঁড়ে বসে। এর পরিণতি সেই জনগোষ্ঠীর জন্য ভয়াবহ হতে বাধ্য। এ কারণে এ ধরনের নীতি বা চিন্তার পরিপোষণ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। সমাজে এ ধরনের চিন্তা যখন প্রবল ও প্রকট হয়ে ওঠে তার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের যোগ থাকে। ইতিহাস সেই সাক্ষ্য দেয়।

সেইদিক থেকে পিটিয়ে জনতার হাতে ছিনতাইকারী বা অপরাধীকে হত্যা এবং র‌্যাবের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' অভিযুক্ত অপরাধীর মৃত্যু– দুটোই একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। র‌্যাবের প্রতি যদি সত্যি সত্যিই জনসমর্থন বাড়ে বা বাড়ছে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা ভাল লক্ষণ নয়। মানুষকে পিটিয়ে বা 'ক্রসফায়ারে' মারাকে যদি আমরা স্বাভাবিক মেনে নিই তাহলে অনেকগুলো বিপদ উপস্থিত হয়। সেই বিপদগুলো সম্পর্কে হুঁশ থাকলে র‌্যাব সম্পর্কে আমাদের বিচার আরও পরিচ্ছন্ন হবে। কয়েকটি বিপদের কথা বলছি।

এক. যদি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় অপরাধের বিচার আর অপরাধীর প্রতি ইনসাফের কোন ভূমিকা না থাকে তাহলে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের নৈতিক ভিত্তি নষ্ট হয়। সংবিধান ও আইন নিছকই আইন-আদালত, উকিল-ব্যারিস্টারদের ব্যাপার নয়– পরস্পরের প্রতি দায় ও জবাবদিহিতা প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও বটে।

দুই. অপরের প্রতি বা অপর মানুষের প্রতি সংবেদনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চা যদি না থাকে সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়ে। এই ফাঁকা জায়গাগুলোতেই সন্ত্রাসের চাষাবাদ হয়। অপরাধীও এই অন্যায় ও অসম সামাাজিক ব্যবস্থার এক ভুক্তভোগী– এই বোধ সমাজের দরকার। তার প্রতি সমাজেরও দয়া আছে এবং সমাজ তা চর্চা করে– এই সত্য যদি অপরাধীর কাছে প্রতিষ্ঠিত করা না যায়– তাহলে অপরাধ ও অপরাধীর সামাজিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তিন. যে সমাজে দয়ামায়া, মমতা নেই সেই সমাজকে তথাকথিত অপরাধীরাও কেন 'স্বাভাবিক' সমাজ বলে মানবে? তখন অপরাধের জগত থেকে অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা কখনোই সম্ভব হয় না। এদিক থেকে র‌্যাব, কোবরা, চিতা মার্কা সমাজ যেমন 'অস্বাভাবিক', ঠিক তেমনি অপরাধীর সমাজও অস্বাভাবিক। একই বিকৃতির দুই দিক মাত্র। যে সমাজ শুধু শাস্তি দিতে জানে, কিন্তু দয়া দেখাতে জানে না– সেই ধরনের সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। দয়ার এই ধারণাকে নিছকই মানবিক বৃত্তি ভাবার কোন কারণ নেই। কারণ, আধুনিক সংবিধান ও আইনেও 'দয়া'-র স্বীকৃতি আছে। বিচার ও ইনসাফের সার্বজনীন বিধান হচ্ছে– যতক্ষণ অপরাধ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ 'অভিযুক্ত'-কে আইন ও সমাজ কখনোই অপরাধী বলে গণ্য করে না। তারপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরও রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দয়া ভিক্ষা চাওয়ার বিধান আছে।

চার. রাষ্ট্র যদি বল প্রয়োগের সামাজিক, নৈতিক ও আইনি ন্যায্যতা প্রমাণ না করে 'ক্রসফায়ারে' অপরাধীদের মারে তাহলে তথাকথিত 'অপরাধীদের' মধ্যেও পাল্টা বল প্রয়োগের ক্ষমতা বেড়ে উঠতে বাধ্য। তার মানে, র‌্যাবের কার্যক্রম সাময়িক সুফল বয়ে আনলেও তার পরিণতি হবে মারাত্মক। যদি বন্দুকের পেছনে বিবেক না থাকে তাহলে সেই বন্দুক পাল্টা আমাদের টার্গেট করতে পারে। বিবেকই অপরাধ ও অপরাধী দমনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে, ট্রিগার না। ট্রিগারই যদি প্রধান হয়ে ওঠে– তাহলে বন্দুকের হাতবদল হতে বাধ্য। বিবেক আর বন্দুকের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিবেক মানুষকে ছেড়ে যায় না। বন্দুকের হাতবদল হয়। আজ যিনি শিকার করছেন, কাল তিনি শিকারের লক্ষ্যবস্তু হবেন। কিন্তু বিবেকের ক্ষেত্রে এটা হয় না। বন্দুকের পেছনে কি আছে তার দ্বারাই বন্দুক দিয়ে কি কাজ হচ্ছে তার ন্যায়-অন্যায় বিচার করা হয়। বিপ-বীর হাতের বন্দুক আর ডাকাতের বন্দুকের মধ্যে পার্থক্য আছে। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সশস্ত্রতা কি 'অপরাধ' ছিল? কিন্তু পাকিস্তানি সংবিধান, আইন কিংবা সামরিক বাহিনী পুলিশ গোয়েন্দা সবার কাছেই সেটা ছিল 'দুস্কৃতকারী' বা অপরাধীর অপরাধ সংঘটন।

পাঁচ. যদি এই তৃতীয় যুক্তিটা আমরা বুঝি তাহলে এই আশঙ্কা অমূলক নয়, র‌্যাব শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রাইভেট আর্মি হিসেবে গণমানুষের রাজনীতি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে একদিন ব্যবহৃত হবে। আজ পিচ্চি হান্নান হয়তো 'দুস্কৃতকারী', কিন্তু কাল একজন বিপ-বী রাজনৈতিক কর্মীকেও 'সন্ত্রাসী' বলে ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হবে। যেমন- সিরাজ সিকদারকে এবং বাকশাল আমলে নির্বিচারে 'নকশাল'দের হত্যা করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রশ্ন, কি অপরাধ আর, কি অপরাধ নয়, তার সিদ্ধান্তই বা কে নেবে? আজ না হয় র‌্যাব 'দুর্ধর্ষ ' সন্ত্রাসীদের মারছে। কিন্তু কাল এই র‌্যাবই ব্যবহৃত হবে সেসব রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে, যারা জোট সরকার কিংবা আওয়ামী শাসকদের বিরোধী। অর্থাৎ বাংলাদেশের সম্পদশালী ও ছোটবড় পুঁজির মালিক এবং চাকরিজীবী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যারা খেটে খাওয়া মানুষ এবং কৃষক শ্রমিকের স্বার্থে লড়াই সংগ্রাম করছেন তাদেরও কি মারবে না এই ধরনের র‌্যাব, চিতা, কোবরা? এই নামে না হোক হয়তো সাপ, ব্যাঙ, গিরগিটি টিকটিকি ইত্যাদি কোন না কোন নামে?

যাক। এবার আসি দ্বিতীয় ধরনের প্রতিক্রিয়ায়। যারা র‌্যাবের বিরোধিতা করেন এবং র‌্যাববিরোধী লেখালেখি পছন্দ করেন। এর আগে সম্পদশালী, ছোটবড় পুঁজির মালিক ও সচ্ছল চাকরিজীবীদের কথা বলেছি। তাদের তো র‌্যাবের পক্ষেই হওয়ার কথা। কিন্তু তাদেরই একটা অংশ আবার র‌্যাবের বিরোধিতা করছে। তাদের মধ্যে দুটো ধারা আছে। এক হচ্ছে- মানবাধিকার রক্ষার জন্য সক্রিয় এনজিওগুলোই এক্ষেত্রে সোচ্চার। তারা একটা নীতিগত জায়গা থেকে বিরোধিতা করছেন, যদিও 'মানবাধিকার' সংক্রান্ত সংজ্ঞা এনজিও কর্মকাণ্ডের পরিমণ্ডল এবং দেশের বাইরে থেকে আসা অর্থের সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট। এই শ্রেণীর অপর যে অংশ র‌্যাবের বিরোধিতা করছে তারা প্রধানত আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী ধারার পন্থী। নিছকই সংকীর্ণ দলীয় উদ্দেশ্য ছাড়া তাদের সমালোচনাকে অধিক মূল্য দেয়ার কোন কারণ নেই। তবে তাদের সমালোচনাই আমরা বেশি জোরে শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তাদের এই সমালোচনা আদৌ কোন সুস্পষ্ট আওয়ামী নীতির ইঙ্গিত নয় বা এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ কি করবে তারও কোন ইশারা

নয়। এসব সমালোচনা জোট সরকারকে খেয়ে না খেয়ে সর্বক্ষেত্রে বিরোধিতা করার নিত্যকর্মের মধ্যেই পড়ে। সেই দিক থেকে এসব সমালোচনা একান্তই কৌশলগত– কোন নীতিগত অবস্থান নয়। এই বিরোধিতা শ্রেণীগত কারণে নয়। মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যে যারা এনজিওগুলোর তরফে বিরোধিতা করছেন তাদের কাছেও এটা কতটা নীতি আর কতটা এনজিও কর্মসূচী– সেটা বিচার করা মুশকিল। শ্রেণীগত কারণে সমাজের সম্পদশালী, ছোটবড় পুঁজির মালিক ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে সচ্ছল অংশ র‌্যাবের পক্ষে থাকবে, আমাদের এই অনুমান তাদের কৌশলগত বা পেশাগত বিরোধিতা দ্বারা নাকচ হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে একই শ্রেণীর দুই অংশের মধ্যে র‌্যাবের পক্ষে-বিপক্ষে থাকা অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু এই পক্ষাবলম্বন দিয়ে র‌্যাব সংক্রান্ত সামাজিক-রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ককে আমরা বুঝব না। সেক্ষেত্রে যারা তথ্য, যুক্তি, বুদ্ধি, বিচারবোধ থেকে তাদের কথা পেশ করছেন তাদের প্রতিক্রিয়া বোঝা জরুরি। তারা পক্ষেই বলুন আর বিপক্ষেই বলুন। তর্কটা আমাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বারো জুলাই, ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী র‌্যাব গড়া হয়েছে 'The Armed Police Battalions (Amendment) Act 2003' নামক আইনি বিধানের আওতায়। এ ধরনের প্যারা মিলিটারি ফোর্স গঠন আকস্মিক বা নতুন কিছু নয়। যারা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে র‌্যাবের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন তাদের কথা হল এ ধরনের সংস্থা আমাদের দরকার, কারণ অন্য দেশেও এরকম সংস্থা আছে। অপরাধ ও অপরাধের সঙ্গে *সংশ্লিষ্ট* বিষয়াদি তদন্ত করা, বিশেষত সরাসরি 'সরকারের নির্দেশে' যে কোন অপরাধ 'তদন্ত'(investigate) করা RAB এর কাজ। সরকার যেখানে একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা ভোগ করে এবং যেখানে বিচার বিভাগ এখনও নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক নয়, সেখানে 'সরকারি নির্দেশে' এ ধরনের বাহিনীর 'তদন্ত' করার ক্ষমতা কার্যত ক্ষমতাসীন সরকারের প্রাইভেট আর্মি হিসেবেই কাজ করা। র‌্যাব গঠন করার বিধানের ৬ বি ধারা অনুযায়ী, 'The government may, at any time, direct the Rapid Action Battalion to investigate any offence.'

বিশ্ব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার অসম, অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের প্রক্রিয়া ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। ধনী-গরিবের ব্যবধান বাড়ছে দ্রুত। শাসক ও শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উভয় ধরনের বিক্ষোভ-প্রতিবাদও বাড়ছে। এরই একটা কুফল হচ্ছে 'সন্ত্রাস' ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি। নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয় বরং সন্ত্রাসের আর্থ-সামাজিক কারণগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যারা র‌্যাবের পক্ষে বলছেন, তারা বিষয়টিকে অপরাধ ও অপরাধ দমনের জায়গা থেকেই বিচার করছেন। যেন অপরাধ বা সন্ত্রাস আর্থ-সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসরের বাইরের কোন ব্যাপার। এখানেই তাদের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ঘটে যায় এবং আমরা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়াই। আশা করি, ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আমরা অপরাধ ও সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারব।

২৭ কার্তিক ১৪১১
১১ নভেম্বর ২০০৪
ফরহাদ মজহার: কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক

১২

প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০০৪

'ক্রসফায়ার'

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

একটা দেশে মাঝে মাঝে এক-দুটি শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। আমাদের দেশে 'ভাবমূর্তি' বলে একটা শব্দ ছিল, গুরুগম্ভীর এই শব্দটা আজকাল আর কেউ ব্যবহার করতে চায় না। মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী গাল ফুলিয়ে এই শব্দটার অপব্যবহার করে শব্দটার গুরুত্বটাই নষ্ট করে দিয়েছেন। ইদানীং 'বিচারক' শব্দটা বিপদগ্রস্ত– শুনলেই জাল মার্কশিটের কথা মনে আসে, দেয়ালে হিসি করার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাওয়া ভবন এবং যুবরাজদের কল্যাণে হাওয়া শব্দটি মনে হয় পাকাপাকিভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে, কবি-সাহিত্যিকরা লেখালেখিতে 'কার্তিকের হিমেল হাওয়া' জাতীয় কিছু না লিখে 'কার্তিকের হিমেল বাতাস' লিখতে মনে হয় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন। ইদানীং যে শব্দটাকে পাকাপাকিভাবে পরিবর্তন করে দেয়া হলো সেটা হচ্ছে 'ক্রসফায়ার'। শব্দটা ইংরেজি কিন্তু মনে হচ্ছে বাংলা ভাষায় বেশ ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছে। ইংরেজিতে ক্রসফায়ারের অর্থ ডিকশনারিতে যেটাই হোক না কেন, বাংলায় এর অর্থ গ্রেফতারের পর মৃত্যু। বাংলাদেশে এই শব্দটি পরিচিত করেছে র‌্যাব নামক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আমি যখন প্রথম খবরের কাগজে র‌্যাব বাহিনীর কথা পড়েছি তখন যে বিষয়টা আমার প্রথমে নজরে পড়েছে সেটা হচ্ছে তাদের মাথায় কালো রুমাল। মানুষের শরীরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার মস্তিষ্ক, সেই মস্তিষ্ককে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতি তার নিজস্ব ব্যবস্থায় সেটাকে শক্ত করোটির মাঝে আড়াল করে রেখেছে। শরীরের কোথাও আঘাত লাগলেও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে, মাথায় ছোটখাটো আঘাত লাগলেই সেটা গুরুতর হয়ে যায়। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা মাথায় ধাতব হেমলেট পরেন। এমনকি যারা কল-কারখানায় বা নির্মাণকাজে ছোটাছুটি করেন তারাও আজকাল মাথায় হার্ড হ্যাট পরেন। অথচ র‌্যাব বাহিনী– যাদের তৈরি করা হয়েছে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সামনাসামনি গোলাগুলি করে ধরপাকড় করার জন্য তাদের মাথায় কেন হেলমেট নেই, সেটা বোঝা কঠিন। খবরের কাগজে কিংবা টেলিভিশনে দেখানোর সময় তাদের মাথায় কালো রুমাল থাকলে থাকুক; কিন্তু সত্যি সত্যি তারা যখন কোনো অপারেশনে যান, কর্তৃপক্ষ তাদের মাথায় একটা হেলমেট দেবেন আশা করি।

আমার ধারণা, মাথায় কালো রুমাল এবং চোখে কালো চশমা দেয়ার বিষয়টি যারা ঠিক করেছেন তারা হলিউডের সিনেমা দেখতে ভালোবাসেন। অনেকটা সিনেমার স্টাইলে তাদের মাঝে এক ধরনের দুর্ধর্ষ ভাব ফোটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তারা নিঃসন্দেহে সফল হয়েছেন, কারণ খবরের কাগজে দেখছি আজকাল সন্ত্রাসীরাও এই

পোশাকটা বেছে নিয়ে র‍্যাব পরিচয় দিয়ে ডাকাতি করতে শুরু করেছে! তবে আমি র‍্যাবের পোশাক নিয়ে আলোচনা করতে বসিনি, আমি তাদের 'ক্রসফায়ার' নিয়ে কথা বলতে চাইছি। আজকাল খবরের কাগজ দেখে মনে হচ্ছে প্রতিদিনই এক-দু'জন মানুষ 'ক্রসফায়ারে' মারা যাচ্ছে। খবরের কাগজের তথ্য অনুযায়ী যারা মারা যাচ্ছে তাদের (প্রায়) সবাই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। আমাদের দেশটি যদি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের মতো একটি দেশ হতো, যদি এই দেশে আইন-শৃঙ্খলা থাকত, যদি বিচার ব্যবস্থা কাজ করত তাহলে হয়তো এই সন্ত্রাসীদেরই বিচার করা হতো এবং তারা হয়তো শেষ পর্যন্ত ফাঁসির দড়িতেই ঝুলত। সন্ত্রাসীরা মারা পড়ছে, বিচারের শেষে ফাঁসির দড়িতে না ঝুলে 'ক্রসফায়ারে'– এটুকু মাত্র পার্থক্য।

ক্রসফায়ারের বিষয়টি দেশে খুব জনপ্রিয়। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতো এক-দু'জন মানুষ বা প্রতিষ্ঠান ছাড়া এর সমালোচনা করতে আমি খুব বেশি কাউকে দেখিনি। অনেক সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন আকারে-ইঙ্গিতে পরোক্ষভাবে প্রক্রিয়াটির প্রশংসাই করেছে। ক্রসফায়ারে মারা পড়ার ভয়ে বড় বড় সন্ত্রাসী গা ঢাকা দিয়েছে, যারা জেলখানায় আছে তারাও নাকি জামিনে বের হতে সাহস পায় না। এক-দু'জন সাহস করে বের হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্রসফায়ারে মারা গেছে বলে কাগজে দেখেছি। শুনেছি, দেশের অনেক জায়গায় চাঁদাবাজি-সন্ত্রাসী কমেছে, মানুষজন- ব্যবসায়ীরা নাকি একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। র‍্যাব বিএনপি সন্ত্রাসীদেরও মেরে ফেলেছে বলে অনেকেই এটাকে রাজনৈতিকভাবে 'নিরপেক্ষ' হিসেবেও মেনে নিয়েছে। কাজেই সাধারণ মানুষ বিষয়টাকে বেশ পছন্দ করেছে।

মানুষ হত্যা একটি ভয়ঙ্কর বিষয়। একজন মানুষকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলার মতো এ রকম একটি ভয়ঙ্কর বিষয়কে সাধারণ মানুষ কেন পছন্দ করছে– বাংলাদেশে সেটি বোঝা খুব কঠিন নয়। একটা সময় ছিল যখন মানুষ অপরাধ করত গোপনে, মুখে কাঁচুমাচু ভাব থাকলে আমরা সেটাকে বলি 'মুখে অপরাধী ভাব'– আজকাল এ কথাগুলো পরিবর্তনের সময় এসেছে। আজকাল অপরাধ গোপনে করতে হয় না, অপরাধীরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে অপরাধ করে। মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য সন্ত্রাসীরা বাসায় হামলা করছে, অসহায় বাবা তাদের থামানোর চেষ্টা করছেন– পারছেন না, মেয়ে তখন ঘরের ভেতর গলায় দড়ি দিয়ে সব ঝামেলা শেষ করে দিয়েছে। এটি বর্তমান বাংলাদেশের চিত্র। দল বেঁধে অবুঝ কিশোরীকে ধর্ষণ করতে এসেছে, মা অনুনয় করে বলছে একজন একজন করে যেতে– এটাও বর্তমান বাংলাদেশ। বর্তমান বাংলাদেশের এই সন্ত্রাসীদের হাতের কাছে পেলে যেকোনো মানুষ তাদের খুন করে ফেলতে চাইবে। কাজেই যখন দেশের মানুষ শুনতে পায় র‍্যাবের সদস্যরা তাদের খুন করে ফেলছে তারা বিচলিত হয় না, তারা এটাকে সাধুবাদ জানায়।

সাধারণ মানুষ সাধুবাদ জানাতে পারে, খুশিও হতে পারে কিন্তু এটা কেমন করে হলো যে একজনকে ধরে কোনো বিচার না করেই খুন করে ফেলা হয় এবং সেজন্য দেশের মানুষ খুশি হয়? আমাদের জীবনে হয়তো স্বস্তি এসেছে কিন্তু এটি কোন ধরনের স্বস্তি? কেন আমরা জঙ্গলের আইনে স্বস্তি চাইব? কেন আমরা সভ্য দেশের সভ্য মানুষের মতো অপরাধীর বিচার করে শাস্তি দিয়ে স্বস্তি চাইব না? এই দেশের শাসকদের কী অধিকার আছে পুরো দেশটাকে অসভ্য-জংলি মানুষের দেশে পরিণত করে দেয়ার? শুধুই কি র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে মানুষ মারা যাচ্ছে? প্রতিদিনই কি সাধারণ মানুষের হাতে ধরা পড়ে চোর-ডাকাত ও সন্ত্রাসীরা খুন হয়ে যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ কেন মানুষ খুন করবে? এটা কী রকম সমাজ? আমাকে কেন এ রকম সমাজে বাস করতে হবে? একটা সরকারের কত বড় অধঃপতন হলে মানুষকে এ রকম সমাজে বাস করতে হয়?

কয়েক মাস আগে আমি একবার পান্থপথ দিয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম সব গাড়ি থেমে গেছে। কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে দেখি সামনে অনেক মানুষের ভিড়, তাদের হাতে লাঠি এবং রড, তারা সেগুলো নিয়ে ছুটছে। ভালো করে তাকিয়ে মনে হলো সবাই মিলে একজন মানুষকে পিটাচ্ছে। একেবারে দিনেদুপুরে শহরের ব্যস্ত কেন্দ্রস্থলে একজন মানুষকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে এবং সবাই সেটা কৌতূহল নিয়ে দেখছে। পুরো বিষয়টিকে আমার কাছে কেমন যেন অবাস্তব বলে মনে হতে থাকে। কিছুক্ষণ পর মানুষের ভিড় একটু কমে গেলে আমি হতভাগ্য মানুষটিকে দেখতে গেলাম, পথের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। সারা শরীর রক্তাক্ত। মুখ দিয়ে ফেনার মতো রক্ত বের হচ্ছে। মানুষটি তখনো বেঁচে আছে কি না বোঝার উপায় নেই। তখন আমি আমার জীবনের দেখা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম, বেশ কিছু মানুষ হতভাগ্য মানুষটির দিকে এগিয়ে আসছে, সবার সামনে দীর্ঘদেহী একজন যুবক। তার হাতে একটি বোতল। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত মানুষটির কাছাকাছি এসে যুবকটি বোতল থেকে তরল পদার্থটি তার শরীরে ঢেলে দিল, তারপর কিছু বোঝার আগেই পকেট থেকে লাইটার বের করে সে মানুষটির শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে মানুষটির শরীরে আগুন ধরে গেল। ঢাকা শহরের প্রকাশ্য রাজপথে শত শত মানুষ, পুলিশের সামনে একজন মানুষের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, কী ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে থেকে আমার মনে হতে থাকে আমরা কি একটা সভ্য দেশের মানুষ? এ দেশটি কি সভ্য মানুষের দেশ? অপরাধীকে ধরবে পুলিশ, তাদের বিচার করবে বিচারকরা, তা যদি না করা হয় তাহলে সেই অপরাধীরা দেখতে দেখতে দানবে পরিণত হয়ে যায়। একটা দেশে যখন দানবেরা সদর্পে ঘুরে বেড়ায় তখন তাদের শায়েস্তা করার জন্য সাধারণ মানুষেরাও দানব হয়ে যায়। এটাই কি আমরা চাইছি? ভবিষ্যতের বাংলাদেশ সবাই হবে একজন করে দানব?

আমরা দানব হতে চাই না। আমরা চাই না একটা ছোট শিশু ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যেতে যেতে দেখুক রাস্তার পাশে একজন মানুষকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে এবং সবাই *সোল্লাসে* সেটা দেখছে। এ দেশের সরকার সন্ত্রাস দমনের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছিল– তাদেরকে তাদের কথা রাখতে হবে। সভ্য দেশে পুলিশ-বিচার বিভাগ যেভাবে কাজ করে সেভাবে কাজ করতে হবে। এ দেশের সাধারণ মানুষকে ভয়ঙ্কর অপরাধীর পেছনে লেলিয়ে দেয়া যায় না। এ দেশের পুরো একটি প্রজন্মকে তারা ধ্বংস করে দানবে পরিণত করতে পারবে না।

আমাদের দেশে সন্ত্রাসীদের উত্থানের প্রধান কারণটি আমরা সবাই জানি। সেটি হচ্ছে তাদের রাজনৈতিকভাবে প্রশ্রয় এবং আশ্রয় দেয়া হয়। একজন সফল সন্ত্রাসীর একজন গডফাদার থাকে এবং এ গডফাদাররা সাধারণত রাজনৈতিক মানুষ, তারা সন্ত্রাসীদের সব রকম ঝুট-ঝামেলা থেকে রক্ষা করেন। আমাদের দেশের গডফাদার কারা সবাই সেটা জানে, কিন্তু ভাশুরের নাম যে রকম মুখে আনতে হয় না ঠিক সে রকমভাবে গডফাদারদের নাম প্রকাশ্যে উচ্চারিত হয় না।

খবরের কাগজগুলোও মুখ ফুটে কিছু বলে না। একসময় বড় ধরনের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগাযোগ রাখার ব্যাপারে রাখঢাকের ব্যাপার ছিল, এখন নেই। মন্ত্রী-সাংসদদের মিটিংয়ে তারা প্রকাশ্যে তাদের আশপাশে থাকে। সরকার পরিবর্তন হলে তারা ফুলের তোড়া নিয়ে সরকারের দলে যোগ দেয়, খবরের কাগজে সে ছবি ছাপা হয়। গডফাদারদের স্পর্শ না করে শুধু সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে গুলি করে মেরে ফেললে দেশের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হবে, সেটা আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি বিশ্বাস করি না। এক খাঁটি সন্ত্রাসীর ফাঁকা জায়গা পূরণ করার জন্য হাজারটি শিক্ষানবিশ সন্ত্রাসী অপেক্ষা করছে। গডফাদারের গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া মাত্রই তারা তাদের জায়গা দখল করে নেবে। যখন শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয় তখন হাতে-পায়ে ফুসকুড়ি বের হয়। গডফাদাররা হচ্ছে আর্সেনিক আর সন্ত্রাসীরা হচ্ছে ফুসকুড়ি। যার শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হয়েছে তার ফুসকুড়িতে মলম লাগিয়ে কী হবে? যতদিন পর্যন্ত আর্সেনিক শরীর থেকে দূর করা না হচ্ছে ততদিন একটি ফুসকুড়ি ভালো হলে ১০টা নতুন ফুসকুড়ি বের হবে।

আমার ধারণা, সন্ত্রাসীদের ক্রসফায়ারে মেরে ফেলার পেছনে আরও একটি অশুভ পরিকল্পনা কাজ করছে। গডফাদারদের সব অপকর্মের প্রধান সাক্ষী হচ্ছে এই সন্ত্রাসীরা। যদি সত্যিকার অর্থে কখনো এই সন্ত্রাসীদের বিচার করা হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে এই গডফাদাররা। চট্টগ্রামে ভাগ্নে রমজান নামে একজন সন্ত্রাসী কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে, র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা না যাওয়ার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সাপ্তাহিক ২০০০ (২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪)-এ তার একটি সুদীর্ঘ ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে। সেখানে সে তার গডফাদার হিসেবে যাদের নাম উল্লেখ করেছে সেগুলো একনজরে দেখলে সবার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত যেসব সন্ত্রাসী র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা গেছে তাদের সবাইকে যদি বিচারের কাঠগড়ায় আনা যেত তাহলে দেশের মানুষ এ রকম সব গডফাদারের নাম জানতে পারত। এই দেশটি চতুর্থবারের মতো পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে নিন্দিত হয়েছে, সেটি দেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জন্য হয়নি, সেটি হয়েছে এ ধরনের কিছু মানুষের জন্য। দেশের সব মানুষের জানার অধিকার আছে কাদের কলঙ্ক তাদের ঘাড়ে করে বহন করতে হচ্ছে।

কাজেই আমি যখন প্রত্যেকবার খবরের কাগজে দেখতে পাই র‍্যাবের হাতে আরও একজন সন্ত্রাসী প্রাণ হারিয়েছে, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। কারণ আমি জানি, এই সন্ত্রাসীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোনো একজন গডফাদার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আনন্দে বগল বাজাতে শুরু করেছে। কারণ তার সব অপকর্মের সবচেয়ে বড় সাক্ষী পৃথিবী থেকে সরে গিয়ে তার জীবনটুকু আরেকটু নিরাপদ হয়েছে, আরেকটু নিশ্চিত হয়েছে। এই সন্ত্রাসীরা হচ্ছে গডফাদারদের ফ্রাঙ্কেনস্টাইন– র‍্যাব শুধু ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের হত্যা করছে, যারা এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছে তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। আমরা সেটা মেনে নিতে পারি না, সমাজ থেকে শুধু সন্ত্রাসীরূপী ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের দূর করলে হবে না, যারা এই সন্ত্রাসীদের জন্ম দিয়েছে, লালন করেছে– তাদেরও দূর করতে হবে।

র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' সন্ত্রাসীদের মৃত্যু কোনোভাবেই কাকতালীয় বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হতে পারে না। নিশ্চিতভাবেই অনেক ওপরের মহল থেকে অনেক চিন্তাভাবনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বড় বড় মন্ত্রী, আমলা এবং কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই দীর্ঘসময় কথাবার্তা বলেছেন, আলোচনা করেছেন তারপর ঠিক করেছেন যে যেহেতু সন্ত্রাসীদের ধরা যায় না বা ধরা গেলেও বিচার করা যায় না– কাজেই পুরো ব্যাপারটা শর্ট সার্কিট করে ফেলা হোক। ধরা মাত্রই গুলি করে মেরে ফেলা হোক। কেউ কেউ নিশ্চয়ই দ্বিধা প্রকাশ করেছেন– একজন মানুষ হোক না সে একজন বড় সন্ত্রাসী, কোনো রকম বিচার না করে তাকে মেরে ফেললে দেশ-বিদেশে পত্রপত্রিকায় সাধারণ মানুষের মাঝে কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে? আমি নিশ্চিত তখন স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের রক্ষী বাহিনীর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। তার ভালো মন্দ নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং ঠাণ্ডা মাথায় এই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছে। এখন আমরা তার ফলাফল দেখছি, খবরের কাগজ খুললেই ক্রসফায়ারে মৃত্যুর খবর।

কোনো রকম বিচার না করে একজন মানুষকে খুন করে ফেলা খুব ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, সেটা সম্ভবত আরও বেশি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। শুধু যে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি তা নয়, ব্যাপারটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিংবা নৈতিকভাবে সমর্থন করছি সেটা অচিন্তনীয় একটি ব্যাপার। এ মুহূর্তে সাধারণ মানুষেরা আপত্তি করছে না, কারণ খুন হচ্ছে শুধু সন্ত্রাসীরা, কিন্তু বিষয়টি যদি আরও একধাপ অগ্রসর হয়? কোন দিকে অগ্রসর হতে পারে, সে ব্যাপারে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ইতোমধ্যে একটা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসী সংবাদপত্রকে র‍্যাবের আওতায় আনা যায় কি না, সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার। তিনি কথাটা চিন্তাভাবনা করে বলেছেন, নাকি দেশের মানুষের সঙ্গে মশকরা করেছেন আমি নিশ্চিত নই। সাধারণ মানুষ একটা ভালো কথা বললেও আমরা জানতে পারি না, আমাদের খুব দুর্ভাগ্য ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার মতো একজন মন্ত্রী মশকরা করলেও আমাদের সেটা খবরের কাগজে পড়তে হয়। সংবাদপত্রকে সন্ত্রাসী বলার ব্যাখ্যাটি তিনি দেননি, কিন্তু আমরা সেটা অনুমান করতে পারি। যেসব সংবাদপত্র তাদের অপকর্মের কথা ছাপে, তাদের চোখে সেগুলোই সন্ত্রাসী সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের পর নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীদের কথা আসতে পারে, কবি-সাহিত্যিকরা আসতে পারে। যাদের লেখালেখি পড়ে তাদের গাত্রদাহ হয় তাদের সন্ত্রাসী বুদ্ধিজীবী কিংবা সন্ত্রাসী লেখক বলে ঘোষণা করে দিলে কার কী বলার থাকবে? সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিকদের শায়েস্তা করে নেয়ার পর তাদের আসল টার্গেট রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল শুরু করা যেতে পারে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা করে তাদের পেছনে র‍্যাবকে লাগিয়ে দিলেই হয়। যারা সমাজ থেকে গুলি করে অপরাধীদের নির্মূল করে বাহবা পাচ্ছেন সেই র‍্যাবকে যদি ওপর থেকে নির্দেশ দেয়া হয় ক্রসফায়ার করে সাংবাদিক, লেখক আর রাজনৈতিক কর্মীদের শেষ করে দেয়া হোক তখন কী হবে? বিষয়টি তো আমাদের মতো দেশের জন্য এমন কিছু বিচিত্র নয়। একাত্তরে পাকিস্তানি মিলিটারি জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে সলাপরামর্শ করে যে বদর বাহিনী এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের একজন একজন করে শেষ করেছে সেই বদর বাহিনীর কমান্ডার মতিউর রহমান নিজামী তো এখন মন্ত্রী হিসেবেই সরকারের ভেতর আছেন, আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে কেন? চিলির কথা মনে আছে? পিনোচেট সরকারের সেনাবাহিনী সেই দেশের কত মায়ের বুক খালি করেছে, সে কথা পৃথিবীর মানুষ এখনো ভুলে যায়নি– মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সে দেশের সেনাবাহিনী সেই দোষ স্বীকার করেছে। তৃতীয় বিশ্বে কত

স্বৈরাচারী সরকার এভাবে কত সাংবাদিক-সম্পাদক, লেখক ও সমাজসেবককে হত্যা করেছে তার কোনো হিসাব নেই। গণতান্ত্রিক সরকারে তার উদাহরণ কম। আমরা সেই উদাহরণটি তৈরি করার প্রক্রিয়াটি শুরু করেছি। সন্ত্রাসীদের যদি বিনাবিচারে হত্যা করা যায় তাহলে অবাধ্য সম্পাদককে কেন হত্যা করা যাবে না? স্বাধীনচেতা লেখকদের কেন হত্যা করা যাবে না? জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কেন হত্যা করা যাবে না?

যখন সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হচ্ছে তখন দেশের মানুষ বাহবা দিচ্ছে। প্রক্রিয়াটি যদি আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে সাংবাদিক-লেখক পর্যন্ত এগিয়ে যায় তখন কথা বলার মতো, প্রতিবাদ করার মতো মানুষও আর থাকবে না। দেশের সাধারণ মানুষেরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করবে তাদের ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। অপারেশন ক্লিনহার্টে তার নাম ছিল 'হার্ট অ্যাটাক', র‍্যাবের বেলায় এর নাম হয়েছে 'ক্রসফায়ার'। এবারে তার জন্য একটা নতুন নাম আবিষ্কার করতে হবে। ডিকশনারিতে হাজার হাজার শব্দ, নতুন একটা নাম বের করা এমন কী সমস্যা।

হতে পারে আমার সন্দেহ অমূলক। র‍্যাবের কর্মকর্তারা দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক মানুষ, শুধু ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদেরই তারা হত্যা করবে। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার উপদেশ তারা শুনবে না, সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবেন। একাত্তরের বদর বাহিনীর কমান্ডার মতিউর রহমান নিজামীর অসমাপ্ত কাজও তারা সমাপ্ত করতে রাজি হবেন না, এই দেশে কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের সৃষ্টিশীল কাজ করে যাবেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি করবেন, তাদের যুদ্ধ হবে ব্যালট বাক্সে। দেশে সন্ত্রাসের অসহনীয় একটা পরিবেশ থেকে তারা আমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য নিজেদের হাতের অস্ত্র উদ্যত করেছেন, দেশের ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীদের দিকে। ক্রসফায়ারে মারা যাবে শুধু সন্ত্রাসীরা আর কেউ নয়।

তারপরেও আমি এই প্রক্রিয়াটির প্রতিবাদ করতে চাই। অনেক দুঃখে পাওয়া আমাদের দেশটিকে আমরা সভ্য মানুষের দেশ হিসেবে দেখতে চাই। এ দেশের অপরাধীদের বিচার হবে বিচারকের সামনে কাঠগড়ায়, রাতের অন্ধকারে নয়। আমরা সন্ত্রাসীদের বিচার করতে চাই, তাদের মুখে শুনতে চাই কারা তাদের এই দানবে পরিণত করেছে, সেই গডফাদারদেরও বিচার করতে চাই। যদি মৃত্যুদণ্ড দিতেই হয় তাহলে সেটি আমরা বিচারকের মুখে শুনতে চাই, কোনো অস্ত্রের মুখে শুনতে চাই না।

আমরা সভ্য দেশের সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চাই, সেই অধিকারটুকু যদি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় আমরা কি তার প্রতিবাদটুকুও করতে পারব না?

মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক ও অধ্যাপক

১৩

প্রথম আলো, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৪

সন্ত্রাস নির্মূল আইনি পদ্ধতিতেই হোক

সুলতানা কামাল

র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' নিহতের সংখ্যা গড়ে প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত প্রথম দিকে প্রতিদিন গড়ে ১ জনেরও কম থেকে এখন সেই সংখ্যা গিয়ে ২/৩-এ দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার কর্মীরা এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন। বক্তব্য, বিবৃতি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে বিনা বিচারে এরকম প্রাণ সংহারের প্রতিবাদ করছেন এবং এগুলো বন্ধের দাবিও তারা জানিয়ে আসছেন। তারপরও সব প্রতিবাদ ও নিন্দা উপেক্ষা করে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' প্রাণহানি চলছেই এবং এর প্রতি রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সমাজের কিছু কিছু মানুষের, বিশেষত যারা এমন অবস্থানে আছেন যে, খুব সহজেই অন্যদের মনন ও মেধার উপর প্রভাব রাখতে পারেন, তাদের সমর্থন ও প্রতিবাদকারীদের রীতিমতো ধমক-ধামক দেয়ার কারণে মানবাধিকার কর্মী ও সংগঠনগুলো বিচলিত বোধ করতে থাকে। এক পর্যায়ে দেশের বেশ কয়েকটি মানবাধিকার, উন্নয়ন ও নারী সংগঠন একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার দাবি জানায়।

সেই সংবাদ সম্মেলন থেকেই সম্মেলনের আয়োজকদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয় যে, দেশের সাধারণ মানুষ যখন র‍্যাবের এই অপারেশনকে স্বাগত জানাচ্ছে– তারা কেন এর বিরোধিতা করছেন? একটা হিসাব থেকে বলা হয়, দেশের ৮৯ শতাংশ মানুষ র‍্যাবের কার্যকলাপকে সমর্থন করে।

লক্ষ্য করছি অনেকেই সরাসরি, আবার কেউ কেউ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার চিঠিপত্র কলাম বা লেখালেখির মাধ্যমে যারা র‍্যাবের হাতে বিনা বিচারে নিয়মিত মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ বা নিন্দা জানিয়েছেন তাদের সমালোচনা করছেন। তাদের মতে, র‍্যাবের কার্যকলাপের কারণে সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে আসছে, সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ এতে আনন্দিত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে। অনেকে এও দাবি করেছেন যে, জনসাধারণ কিছু কিছু জায়গায় মিষ্টি পর্যন্ত বিতরণ করেছেন।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনের নামে দেশে দেশে যে কঠোর আইন তৈরি হচ্ছে তারও *উল্লেখ* অনেকে করে থাকেন। রক্ষীবাহিনীর প্রসঙ্গও স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। এবং যদিও এই উদাহরণগুলো ব্যবহার করা হয় র‍্যাব বা যৌথ বাহিনীর অপারেশন ক্লিনহার্টের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে– সেটা করতে গিয়ে সন্ত্রাস দমনের নামে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আচরণ অথবা রক্ষীবাহিনীর নিয়োগের উদাহরণ তারা টানেন বটে তবে প্রসঙ্গটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই কেউই প্রশংসার সাথে উচ্চারণ করেন না। এখানে কথার সুরটা থাকে এরকম যে, যেহেতু

ওই সমস্ত ব্যাপারগুলো ঘটছে বা অতীতে ঘটেছে তাই র‍্যাবও সন্ত্রাস দমনে নামতেই পারে। যেন একটি মন্দ কাজ অতীতে করা হয়েছে বা হয়েছিল বিধায় বর্তমানের মন্দ কাজটিরও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

র‍্যাবের সমালোচনার আর একটি প্রতিক্রিয়া উদ্বেগের সৃষ্টি করে। তা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অথবা ব্রিটেন বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে বলে পৃথিবীর কোনো দেশই মানবাধিকারের শর্ত মানতে বাধ্য নয়। যেন মানবাধিকার বিষয়টির মালিক হচ্ছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন; আমাদের– পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নাগরিকদের মানবাধিকারের দলিলে কোনো স্বার্থ নেই, সেই দলিলের প্রতি আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এই দুই দেশ কি করছে না করছে তার উপর নির্ভর করবে আমরা আমাদের দেশে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড মেনে নেব কি নেব না। র‍্যাবের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদের মাঝে অনেকেই মানবাধিকার কর্মীদের বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যও খুঁজতে থাকেন।

দিনের পর দিন সন্ত্রাসীদের পীড়নে অথবা সন্ত্রাসী আক্রমণের আতঙ্কে মানুষকে দিন কাটাতে হলে হয়তো সন্ত্রাস নির্মূলের চরম কিছু পদক্ষেপে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্বস্তিবোধ করতে পারেন– নির্যাতনকারীর চরম শাস্তিও কামনা করতে পারেন– তবে সেটা প্রতিক্রিয়া। প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র চলে না– রাষ্ট্রনীতি প্রণীত হয় না। রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয় প্রাজ্ঞ, সুচিন্তিত, সুদূরপ্রসারী ও গভীর বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, যা উঠে আসে নীতি-নির্ধারকদের এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের ঐতিহাসিক জ্ঞান, তাদের অভিজ্ঞতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং সর্বোপরি গণতন্ত্র ও মানবতার প্রতি আনুগত্য ও সম্মানবোধ থেকে। যার ফলে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে পেয়েছি মানুষের অধিকার রক্ষার বিভিন্ন দলিল। পেয়েছি আমাদের সংবিধান। র‍্যাব এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যে কার্যকলাপ চালাচ্ছে তা সরাসরি আমাদের সংবিধানের লঙ্ঘন। সংবিধানের ৩২ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, আইনানুযায়ী ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। একই কথা জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সনদেও বলা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সেই সনদে স্বাক্ষর করেছে। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আটক করতে পারে অথবা তার জীবন নিতে পারে। র‍্যাব অবশ্যই রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করছে; কিন্তু র‍্যাব যে প্রতিদিন জীবন নিচ্ছে, তা কোনো সন্ত্রাসীরই হোক কী নাই হোক, আইন অনুযায়ী করছে কি? বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি কি তবে র‍্যাবকে সন্ত্রাসী হত্যা করার আইনি অধিকার দিয়েছে? একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এ প্রশ্ন করার অধিকার যেকোনো ব্যক্তির আছে, তার মধ্যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য খুঁজতে যাওয়াটা কতখানি মুক্তমনের পরিচয় রাখে বোঝা কষ্টকর। রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা যান তারা কিন্তু এই শপথ বাক্য পাঠ করে যান যে, ক্ষমতায় গেলে তারা সংবিধান রক্ষা করবেন। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তন করে আইন-আদালত উড়িয়ে দিয়ে সরাসরি হত্যা করার মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূলের ধারা সংবিধানে সংযোজিত না হচ্ছে এবং সেই মতে ফৌজদারি আইন তৈরি না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত র‍্যাবের কার্যকলাপ অসাংবিধানিক এবং বেআইনি তো বটেই। মানবাধিকার কর্মী আর সংগঠনগুলো সেটাই বলে যাচ্ছে। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস দমন হয় না, অতীতেও হয় নাই– তাই যদি হতো তবে রক্ষীবাহিনী, দুই দুইটা সামরিক শাসন আর যৌথ বাহিনীর অপারেশন ক্লিনহার্টের পরে আর র‍্যাবের প্রয়োজন হতো না। সন্ত্রাস নির্মূল হয় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ক্ষমতার অপব্যবহারে নয়।

এরপরেও কথা থাকে যে, যদি সন্ত্রাসীকে মেরে ফেলে সন্ত্রাসমুক্ত করার এই প্রক্রিয়া এত জনপ্রিয় ও জনসমর্থিত তবে 'ক্রসফায়ারের' প্রয়োজন কি? নিছক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য র‍্যাবকে দিয়ে একই গল্পের পুনরাবৃত্তি করানো কেন? র‍্যাব তো একটি অভিজাত বাহিনী, নিশ্চয়ই অত্যন্ত উন্নতমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। র‍্যাব কি আত্মরক্ষায় গুলি ছোঁড়ার এই সাধারণ নিয়মটুকু জানে না যে, হাঁটুর উপরে গুলি লাগতে পারবে না? তারা কি একথাও জানে না যে, মৃত মানুষকে অসম্মান করা যায় না– নয়তো মৃতদেহগুলো এভাবে মাঠে-ঘাটে-রাস্তায় ফেলে রেখে দেয় কি করে? আমরা দেখছি ক্রসফায়ারে প্রতিবার প্রতিপক্ষের গুলিতে র‍্যাবের হাতে ধৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিটিরই মৃত্যু হচ্ছে– অন্য কারো গায়ে গুলি খুব একটা লাগছে না। মাঝে মাঝে র‍্যাব সদস্যদের কেউ কেউ আহত হয়েছেন বলে শোনা গেছে। পুলিশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অথচ খবরে জানা যায়, শিশুরাও 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। আবার মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে এ-ও অভিযোগ আনা হয়েছে যে, হয় তারা সন্ত্রাস নির্মূল চান না এবং চাইলেও সন্ত্রাস দমনের বিকল্প কোনো উপায় নির্দিষ্ট করতে পারছেন না বা করছেন না। বিনয়ের সাথে বলতে চাই সেটাও সত্য নয়। কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য ছিল তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি– যা তাদের চিন্তাভাবনার কিছুটা পরিচয় তুলে ধরবে।

"আমরা মনে করি অভিযুক্ত যেই হোক না কেন, তার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার আছে; আর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যতোই 'এলিট' হোক না কেন তারা কোনোভাবেই সংবিধান বা আইনের উর্ধ্বে নয় এবং তাদের কাজ হচ্ছে আইনের বিধিনিষেধের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করা। আমরা বিচার বিভাগের দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে দিতে পারি না। পুলিশ হেফাজতে 'সন্ত্রাসী'র মৃত্যুর এই রাষ্ট্রীয় অনুমোদন সাময়িক বিচারে কোনো কোনো মহলকে হয়তো স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তা বিচার ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থাহীনতাকে আরও প্রকট করে তুলবে এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ থেকে দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পরিণতিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারাই নির্বিচারে ঘটবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাই প্রশাসনের প্রতি আমাদের সুস্পষ্ট দাবি হচ্ছে–

- পুলিশ হেফাজতে ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক দোষীদের বিচারের ব্যবস্থা করুন
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করুন
- সংবিধান, আইন ও আটক, গ্রেফতার, রিমান্ড ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ আদালতের দেয়া নির্দেশনা মেনে চলতে সকল বাহিনীর ওপর স্পষ্ট নির্দেশ জারি করুন
- সকল বাহিনীর জবাবদিহিতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করুন
- এবং কথা বা কাজের মাধ্যমে এমন কিছু করবেন না, যাতে কোনো বাহিনী নিজেদের দায়মুক্ত ও আইনের উর্ধ্বে বলে ভাবতে পারে।

আমরা বিশ্বাস করি, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাটা একদিনে তৈরি হয়নি, সমাধানটাও একদিনে আসবে না। মাঝখানে কোনো পাঁচমিশালি বাহিনী নামিয়ে কিছুদিনের জন্য হয়তো গুটিকয় 'শীর্ষ সন্ত্রাসী'কে ব্যতিব্যস্ত রাখা যাবে, সাময়িকভাবে তাতে কেউ কেউ কিছুটা স্বস্তিও বোধ করতে পারে; কিন্তু সমস্যাটি তার মূলসহ জায়গাতেই থেকে যাবে, পেছনে রেখে যাবে রাষ্ট্রের হাতে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপজ্জনক নজির।

আমরা প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় খরচ বাড়াতে

বলেছি, সরকার শোনেনি; পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পড়ে রয়েছে, সরকার বাস্তবায়ন করেনি; আমরা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করার কথা বলেছি, সরকার গুরুত্ব দেয়নি; দুর্নীতি কমানোর জন্য ন্যায়পাল আর স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশ ঝুলে রয়েছে বছরের পর বছর, সরকার আমলে নেয়নি।"

আরো বলতে চাই যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বাহিনীর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র অথবা মারণাস্ত্র ব্যবহারের ন্যূনতম নীতিমালাগুলো মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হোক এবং যে আন্তর্জাতিক দলিলগুলো বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হোক।

তাই আমাদের দাবিগুলোর পুনরুক্তি করে আবারও সমাজের সকল মুক্ত, বিবেকবান, চিন্তাশীল এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের কাছে আবেদন রাখছি, সমাজকে এই সন্ত্রাসের চক্র হতে মুক্ত হতে সহায়তা করুন। অন্যায়, অবৈধ, অসাংবিধানিক ও অমানবিক প্রক্রিয়া, যা পক্ষান্তরে সন্ত্রাসকেই বহাল রাখে এবং রাষ্ট্রের উপর সন্ত্রাসী চেহারা আরোপ করে, তার পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক মানসম্পন্ন সমাজের উপযোগী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রকে উদ্বুদ্ধ করুন ও জনগণের জন্য তা নিশ্চিত করার প্রয়াস নিন।

সুলতানা কামাল: আসক-এর নির্বাহী পরিচালক, মানবাধিকার কর্মী

১৪

প্রথম আলো, ১ জানুয়ারি ২০০৫

র‍্যাব ও ক্রসফায়ার

এ কে এম জাকারিয়া

'র‍্যাব' ও 'ক্রসফায়ার' এ শব্দ দুটি বলা যায় বছরের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে প্রায় প্রতিদিনই পত্রপত্রিকার পাতায় স্থান পেয়েছে, টিভি চ্যানেলগুলোর খবরে এসেছে। সন্ত্রাস দমনে গঠিত র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) জুন মাস থেকে মাঠে নামার পর তাদের নিয়মিত অপারেশন ও 'ক্রসফায়ারে' চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ঘটনাগুলো ছিল আলোচনার কেন্দ্রে।

দেশের নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রাস পরিস্থিতি এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠা সন্ত্রাসীদের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ দেশবাসী খুব স্বাভাবিক কারণেই এই বাহিনীর কাজকর্মে খুশি। তবে সমাজের সচেতন অংশ, আইনজীবী ও মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীসহ অনেকেই এই বাহিনীর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্যতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং র‍্যাবের এ ধরনের কাজকর্মের ফলাফল চূড়ান্ত বিচারে কত বিপজ্জনক হতে পারে, সে বিষয়গুলোও উঠে এসেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ বিভাগের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে র‍্যাব গঠন করা হয়েছে। র‍্যাব গঠনের যে আইন পাস হয়েছে, সে অনুযায়ী সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছে। ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করার পর ২১ জুন থেকে এই বাহিনী তাদের অপারেশন শুরু করেছে। অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে র‍্যাবকে একটি এলিট ফোর্স হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে যেকোনো অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষমতা র‍্যাবকে দেয়া হয়েছে।

র‍্যাব তার কার্যক্রম শুরু করার পর চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী ও অপরাধীদের ধরতে এবং অস্ত্র উদ্ধারে বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। ঢাকার পিচ্চি হান্নান, চট্টগ্রামের আহমুইদ্যা, খুলনার লিটু বা নারায়ণগঞ্জের ডেভিডের মতো ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার র‍্যাবের সাফল্য হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে এ ধরনের সন্ত্রাসীদের অধিকাংশই 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর পর জনগণকে স্বস্তি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। অসহায় জনগণ যেকোনোভাবেই যে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মুক্তি চাইছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এর মধ্য দিয়ে। ফলে 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, আইনের শাসন– এ প্রসঙ্গগুলো ছাপিয়েও র‍্যাবের কর্মকাণ্ড জনসমর্থন পাচ্ছে। ২১ জুন অপারেশনে নামার পর এ পর্যন্ত মাসছয়েক সময়ের মধ্যে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' মারা গেছে ৮৯ জন। প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রে র‍্যাব একই ধরনের ঘটনা ও একই 'ক্রসফায়ারের' কথা উল্লেখ করেছে। ফলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাও খুবই স্বাভাবিক। নিহতদের পরিবারের লোকজনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনাগুলো হত্যাকাণ্ড হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সরকার র‍্যাবের কর্মকাণ্ড এবং সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নেয়া উদ্যোগগুলো তাদের সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করছে। 'ক্রসফায়ার' বা মানবাধিকার লঙ্ঘন– এ বিষয়গুলো নিয়ে সরকার আদৌ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না।

আইনমন্ত্রী বলেছেন, র‍্যাবের সঙ্গে ক্রসফায়ারে মৃত্যু মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। তবে দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো 'ক্রসফায়ারকে' হত্যাকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করে একে আইনের শাসন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে দেখছেন। অনেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে এই বাহিনীকে ব্যবহারের আশঙ্কার কথাও বলছেন। বিশেষ করে এই বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকায় এ ধরনের আশঙ্কাকে অমূলক মনে করারও কারণ নেই। র‍্যাবের হাতে আটক হওয়ার পর সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার সাক্ষী সুমনের মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড হিসেবেই উল্লেখ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক মহল। র‍্যাব গঠনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ইতোমধ্যে আদালতে রিটও হয়েছে। র‍্যাবে বিভিন্ন বাহিনীর সদস্য থাকায় শৃঙ্খলাভঙ্গ বা এ ধরনের কোনো অপরাধের শাস্তি কোন ধারা বা বিধি অনুযায়ী নেয়া হবে তা স্পষ্ট নয়। র‍্যাবের হেফাজতে এতগুলো মৃত্যুর পরও এ নিয়ে কোনো তদন্তের উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায়নি। এই বিষয়গুলো সমাজের সচেতন মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে আইনের শাসন, মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার– এ বিষয়গুলো উপেক্ষা করার ফল যে ভালো হতে পারে না সে দিকটির প্রতি তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা না গেলে অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে র‍্যাব যে সাফল্য দেখাচ্ছে তা সাময়িক একটি ব্যাপারে পরিণত হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

এ কে এম জাকারিয়া: সাংবাদিক